ভারত - মার্কিণ পরমাণু চুক্তির অর্থনীতি ও রাজনীতি

গুরুপ্রসাদ কর

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারী জেনারেল রিচার্ড বাটলার সেনাবাহিনীতে ৩৩ বছর ধরে কাজ করে তার অভিজ্ঞতাকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন, ''আমেরিকার সমস্যা হচ্ছে এই যে দেশে বিনিয়োগকৃত ডলার মাত্র ৬% মুনাফা পেলে তা অস্থির হয়ে পড়ে এবং ঐ ডলার তখন ১০০% মুনাফার লক্ষ্যে বিদেশে পাড়ি দিতে চায়। আর ঐ ডলারকে অনুসরণ করে আসে মার্কিণী পতাকা এবং পতাকার পেছনে আসে মার্কিণ সামরিক বাহিনী।'' War Is A Racket: General Smedley Butler, 19 March, 2006.

পরমাণু চুক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, ''আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে, এরা (পরমাণু চুক্তির বিরোধীরা) শুধু কংগ্রেসেরই শত্রু নন। উন্নয়ন ও অগ্রগতিরও শত্রু।'' এবছর আমাদের দেশে ঘটা করে সিপাহী বিদ্রোহের দেড়শো বছর পালিত হচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য যে এই দেড়শ বছর পরেও অভিজাতবর্গের সুর একটুও বদলায়নি। ১৮৫৭ সালে নিপীড়িত মানুষের ব্রিটিশকে উৎখাত করার সংগ্রামকে দেশের তৎকালীন অভিজাত বর্গ দেশদ্রোহিতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই অভিজাত বর্গই ছিল ব্রিটিশ শাসনে ব্রিটিশ আশ্রিত জমিদার, ব্যবসায়ী ও উচ্চরাজকর্মচারী যারাই আবার পরবর্তীতে ব্রিটিশ মদতে তৈরী কংগ্রেসে পার্টির নেতৃত্ব গ্রহন করেন। সেসময় এই অভিজাত শ্রেণী মনে করেছিল যে মহাবিদ্রোহ সফল হলে, ও তার ফলে কোম্পানী শাসন ব্যর্থ হলে স্তব্ধ হবে উন্নয়নের ধারা। ব্রিটিশ শাসনে তাদের যে ভাগ্য খুলে গেছে তা বিপদের মুখে পড়তে পারে। আশ্চর্যজনকভাবে আজকেও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শোষক, যুদ্ধবাজ ও আধিপত্যকারী ও অনুন্নত দেশগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ মার্কিণ শক্তির সাথে দেশীয় শাসকদের অশুভ সখ্যতার যারা বিরোধিতা করছেন, দেশকে কার্যত মার্কিণী উপনিবেশ বানানোর যারা বিরোধিতা করছেন, পরমাণু শক্তি নিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অসম চুক্তির যারা বিরোধিতা করছেন তাদেরকে কি অকপটেই না দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে আর যাই হোক অন্তত একটি জিনিষ প্রমাণ হচ্ছে যে দেশকে এখনও শাসন করছে সেই অভিজাত শ্রেণীর যোগ্য উত্তরাধিকারীরাই যারা সেই মহাবিদ্রোহের সময়ও ব্রিটিশের পক্ষে দাড়িয়েছিলেন। তবে এরকম ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে সোনিয়া গান্ধীর সাফল্যও মিলেছে। সরকারী ক্ষমতায় আসীন বামপন্থীরা প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদের বিরোধিতার সুরই কেবল নরম করেনি, চুক্তি সফল করার লক্ষ্যে সরকারকে পরবর্তী স্তরে এগিয়ে যাবার সম্মতিও দিয়ে দিয়েছেন।

আসলে ভারতের সাধারন মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যেসব আর্থিক ও বানিজ্যিক চুক্তির জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অনেক আগে থেকেই চাপ দিয়ে আসছিল এবং সেগুলি প্রায় সবই গত শতাব্দীর ৯০'র দশক থেকে এই অভিজাত শ্রেণী ও তার যোগ্য প্রতিনিধি ভারত সরকার একে একে মেনে নিয়েছে। আর এই নয়া আর্থিক নীতির ফলাফল ভালোভাবেই টের পাচ্ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, বিশেষত ভারতের কৃষক সমাজ। এরপর বাকী ছিল সামরিক ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে মার্কিণী হুকুম তামিল করা। সে ব্যাপারেও ভারত সরকার অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। পরমাণু চুক্তিটিকে বলা যায় কফিনের শেষ পেরেক। বর্তমানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে বিশ্বজনমত মার্কিণ শাসকদের বিপক্ষে, কারণ তারা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও গ্রীনহাউস গ্যাসের ২৫ শতাংশের নির্গমন ঘটায়। এরকম অবস্থাতেও কার্বন নিয়ে নোংরা ব্যবসার পাশাপাশি গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে মানুষের উদ্বেগকেও ব্যবসায়িকভাবে কাজে লাগাতে নেমে পড়েছে মার্কিণী শক্তিসংস্থাগুলি। আর এ কাজে তারা এম আই টি নামক একটি মার্কিণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের দিয়ে পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষে জনমত তৈরী করবার প্রচেষ্টা নিয়েছে সেই ২০০৩ সাল থেকেই। পরমাণু জ্বালানী ও প্রযুক্তি নিয়ে মার্কিণী শক্তিসংস্থাগুলির বড় আকারে ব্যবসা করবার পরিকল্পনা ও তাদের সহায়ক ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতীয় বৃহৎ ব্যবসায়ীদের আকাংখ্যা এই চুক্তির অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি। আর এশিয়া অঞ্চলে মার্কিণী আধিপত্য বিস্তারে ভারতীয় শাসকদের সক্রিয় সহায়তা ও সেই লক্ষ্য অনুযায়ী নিজেদের বিদেশ নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে এই চুক্তির রাজনৈতিক চালিকাশক্তি। এর পাশাপাশি ভারতে পরমাণু সংক্রান্ত বিষয়ে যে দেশীয় গবেষণা চলছে এই চুক্তির ফলে তার অগ্রগতি তো দূরের কথা, আসলে এই চুক্তি সেই গবেষণাকেও অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

পরমাণু চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে ধরনের জ্বালানী আমরা ব্যবহার করে থাকি তার পরিমাণ যে সীমিত, আর সে জন্য যে আমাদের অন্যান্য অপ্রচলিত প্রাকৃতিক শক্তির (যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি) উপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে হবে এসব নিয়ে তো বহুদিন ধরেই চর্চা চলছে। এরকম অবস্থায় হটাৎ কি হলো যে সরকার বলতে শুরু করলো পরমাণু শক্তি উৎপাদনই একমাত্র বাঁচবার রাস্তা। একথা তো আমরা সবাই জানি যে পরমাণু সংযোজন বিক্রিয়া কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে বড় আকারে শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু তা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। খোদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৭৩ সালের পরে কোন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর তৈরী করা হয়নি। তাহলে কি বলতে হবে যে নিউক্লিয়ার টেকনোলজির ক্ষেত্রে কোন বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটেছে যাতে শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে এবং তা বেশ নিরাপদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে সত্যিই তেমন কিছু ঘটেনি। তাহলে কেন পরমাণু জ্বালানী ও প্রযুক্তি নিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরমাণু চুক্তি সম্পাদনে এত তৎপরতা! সরকারের দিক থেকে এর পক্ষে কোন সরল ব্যাখ্যা তো নেই-ই, উপরন্তু নানান রকম মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নিয়ে এই চুক্তিকে মান্যতা দেবার চেষ্টা চলছে।

এরকম অবস্থায় ভারতবর্ষের রাজনীতি পরমানু চুক্তি নিয়ে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। তবে এই চুক্তি নিয়ে কেবল যে রাজনীতিবিদরাই মাথা ঘামাচ্ছেন তা নয়, বেশ কিছু বিজ্ঞানী, পরমানু প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও দেশ বিদেশ রাজনীতি বিশেষজ্ঞরাও এ ব্যাপারে তাদের মতামত রেখেছেন। চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়েকটি রাজনৈতিক দল বাজার গরম করবার চেষ্টা করছেন তাদের বেশীর ভাগ অংশই যে নীতি সম্পর্কিত বিষয়ের বিশেষ ধার ধারেন না তা আজ সবারই জানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সামনে উঠে এসেছে তা হলো ;

১) আমেরিকার সাথে এই চুক্তি করে কি দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করা হচ্ছে না!

২) এই চুক্তি করে কি আমেরিকার বিশ্ব আধিপত্যের নীতির সাথে নিজেদের জুড়ে নিয়ে একটি স্বাধীন বৈদেশিক নীতির সম্ভাবনাকে বাতিল করা হচ্ছে না!

৩) এই চুক্তি করে কি পরোক্ষভাবে পরমানু শক্তিধর দেশগুলির একতরফা পরমানু নিরস্ত্রিকরণ চুক্তির অধীন হয়ে যাওয়া হচছে না!

৪) বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য পরমানু শক্তি কি বর্তমানে সত্যিই কি কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে ? তাই এটা করা কি আমাদের মতো গরীব দেশের পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয়!

৫) ভারতে সঞ্চিত কয়লা কি সত্যিই আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে নাকি ঘটনার রং চড়িয়ে এই চুক্তির পক্ষে জনমত তৈরী করবার চেষ্টা করা হচ্ছে!

৬) ভারতে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে দেশীয় গবেষণার যে বিকাশ ঘটেছে এই চুক্তি কি তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে নাকি এর পেছনে অন্য কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য রয়েছে!

৭) পরমানু বর্জ্যপদার্থ যে পরিবেশ ও স্বাস্থের বিরাট ক্ষতি করে তা কি আমরা হিসাবের মধ্যে আনবো না!

এই প্রশ্নগুলি নিয়ে এক বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু স্বল্প পরিসরে আমরা এই প্রশ্নগুলি মাথায় রেখে কয়েকটি বিষয় সহজে বোঝার চেষ্ট করবো।

পরমাণু শক্তি : বিজ্ঞান জগতে এক অভিনব আবিস্কার

পরমাণু শক্তির পেছনে যে মৌলিক তত্ত্ব রয়েছে তা গত শতাব্দীর গোড়ার দিককার এক অভিনব আবিস্কার। এই আবিস্কার আসলে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের ফলাফল। এর আগে যে তত্ত্ব ছিল তাতে বলা হতো যে বিশ্বের মোট পদার্থের ভর ও মোট শক্তির পরিমান আলাদাভাবে সংরক্ষিত হয়। এই নিয়মের মধ্যে যা হতে পারে তা হচ্ছে যে একধরনের পদার্থ অন্য ধরনের পদার্থে রুপান্তরিত হতে পারে, আবার এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে রুপান্তরিত হতে পারে। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে জল তৈরী হয়, এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসাবে ডাইনামোর কথা বলা যায় যেখানে যান্ত্রিক শক্তি (যেমন জলবিদ্যুতের ক্ষেত্রে জলের প্রবাহ) বিদ্যুৎ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই যথাক্রমে মোট ভর ও মোট শক্তির কোন হেরফের হয় না। আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখালেন যে ভর যেমন নানান পদার্থের রুপ ধরে থাকতে পারে, শক্তিও যেমন নানান রুপে থাকতে পারে, তেমনি শেষ বিচারে ভর ও শক্তিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, আসলে তারা বস্তুরই দুটি রুপ এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির সমতুল্য এবং এর উল্টোটিও সত্য। তবে আইনস্টাইন যখন এই আবিস্কার করেন তখনও জানা ছিল না যে এই সমতুল্যতা একটি তাত্ত্বিক সত্য নাকি প্রকৃতিতে এরকম বিক্রিয়া সত্যিই রয়েছে যেখানে ভর লুপ্ত হয়ে শক্তিতে রুপান্তরিত হতে পারে। পরে দেখা যায় যে প্রকৃতিতে সত্যিই এরকম বিক্রিয়া রয়েছে। যেমন সূর্য থেকে আমরা যে বিপুল তাপ ও আলোক শক্তি পেয়ে থাকি তা আসলে নিউক্লিয়ার সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যের ভর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েই তৈরী হয়। আবার মানুষও পরীক্ষাগারে নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার

সাহায্যে ভর লুপ্ত করে শক্তি তৈরী করতে সক্ষম হয়। এই নিউক্লিয়ার বিভাজন প্রক্রিয়াতে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করা হয় যার ফলে ঐ নিউক্লিয়াস অন্য দুটি অপেক্ষাকৃত হালকা দুটি মৌলের নিউক্লিয়াসে ভেঙে যায় এবং এই প্রক্রিয়াতে কিছুটা পরিমাণ ভর লুপ্ত হয়ে তাপশক্তি তৈরী হয়।

এই আবিস্কারের ফলে দুটি নতুন জিনিসের সূচনা হলো যথা :

ক) মানুষ শক্তি তৈরী করবার একটি নতুন উৎসের সন্ধান পেলো।

খ) বিশ্বে আধিপত্যকারী শক্তিগুলি নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে এই শক্তিকে মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলো।

পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার ও তৎপরবর্তী বিকাশ

একথা আমরা সবাই জানি যে ১৯৪২ সালে আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এনরিকো ফের্মির নেতৃত্বে বিজ্ঞানীরা পরমানু সংযোজন বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হন যে বিক্রিয়াতে ভর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে বিপুল পরিমান শক্তি উৎপন্ন হয়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, আর পাশাপাশি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক পরিমান বিজ্ঞানীকে নিয়োজিত করেছে পরমানু অস্ত্র তৈরী করবার কাজে। এ কাজে সফলতাও পায় তারা। ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই আমেরিকার মরুভূমি অঞ্চলের ট্রিনিটিতে পৃথিবীর বুকে প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ হয় এবং পৃথিবীর বুকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম পারমাণবিক অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সাল নাগাদ যুদ্ধে আক্রমনকারী শক্তি জার্মান ও জাপান পর্যদুস্ত। রাশিয়ান জনগণ বিপুল আত্মত্যাগ করে জার্মানকে পরাজিত করেছে। এমতাবস্থায় আমেরিকা ১৯৪৫ ৬ই ও ৯ই আগষ্ট যথাক্রমে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি এই দুটি সহরে পরমানু বোমা নিক্ষেপ করে। এতে যে এক বিরাট সংখ্যক মানুষের নিমেষে মৃত্যু হয় ও বিপুল পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তেজস্ক্রিয়তার ফলে সেখানে কয়েক প্রজন্ম ধরে মানুষ যে নানান ধরনের মারাত্মক রোগের শিকার এসবের হিসাব আমরা নানান জায়গা থেকে পেয়ে থাকি। কিন্তু যেটা বোঝা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে যে এই বোমা ফেলার পেছনে মার্কিনী শাসকদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সারা পৃথিবীর কাছে একথা জানান দেওয়া যে এখন থেকে পৃথিবী শাসন করবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কারণ তার হাতেই রয়েছে পৃথিবী থেকে যে কোন রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ক্ষমতা। তাই এখন থেকে সবাইকে তার কথা মতো চলতে হবে। এর পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া সহ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া দেশের মানুষের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সমাজতন্ত্রকে পৃথিবী থেকে মুছে দেবার জন্য সে সোভিয়েত রাশিয়াকে পরমানু বোমা দিয়ে আঘাত করবার চক্রান্ত চালিয়ে যায়।

এরকম একটি অবস্থায় বিশ্বশান্তি ও নিজের দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের 'পারমাণবিক শক্তি কমিশন'-এর কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে দলিলটি [১] পেশ করা হয় তার প্রথম ধারাতেই বলা হয় :

(ক) কোনও পরিস্থিতিতেই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না,

(খ) পারমাণবিক শক্তির ভিত্তিতে সৃষ্ট অস্ত্রের উৎপাদন ও মজুতকে নিষিদ্ধ করতে হবে,

(গ) তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ - জমে থাকা সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

দ্বিতীয় ধারায় বলা ছিল যে প্রথম ধারাকে অমান্য করলে তা মানবতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। আর তৃতীয় ধারায় বলা ছিল : ছয় মাসের মধ্যে এইসব নির্দেশিকা অমান্যকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার মতো আইন লাগু করতে হবে। সোভিয়েতের পক্ষ থেকে এরকম আহ্বান ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালেও রাখা হলো, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই এধরনের প্রস্তাবে রাজি হলো না। এমতাবস্থায় রাশিয়া ১৯৪৯ সালে জানালো যে ১৯৪৭ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু অস্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। একইসঙ্গে তারা একথাও বললো যে আগেও যেমন তারা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে নিঃশর্ত নিষিদ্ধকরণের পক্ষে ছিল, আজও তাই আছে, এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ১৯৪৫ সালে মার্কিণ শাসকদের হাতে পরমাণু বোমা পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট আতঙ্ক তৈরী করেছিল আর ১৯৪৭ সালে সোভিয়েতের হাতে পরমাণু বোমা পৃথিবীকে তখনকার মতো মার্কিনী আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

তবে বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষের দিক থেকে পরবর্তীতে সোভিয়েত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে এবং তারাও পারমাণবিক ক্লাবের অহঙ্কারী সদস্যে রুপান্তরিত হয়। যে সোভিয়েত ছিল পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির জনগণের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় মিত্র সে-ই এবার পরমাণু অস্ত্রের জুজু দেখিয়ে জনগণকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে নিরস্ত্র করবার জন্য সেই কুখ্যাত উক্তি তুলে ধরে যাতে বলা হয় 'একটি স্ফুলিঙ্গই একটি দাবানল সৃষ্টি করতে পারে।' তাদের মত ছিল যে পরমাণু বোমার উদ্ভবের কারণে যুগের চরিত্র বদলে গেছে। এ যুগে বিশ্বশান্তির পক্ষে সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও শোষণ মুক্তির পথ নয়, বরং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দুটি

পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে বোঝাপড়াই বিশ্বশান্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির ও সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র গ্যারান্টী। কি নির্লজ্জভাবেই না ক্রুশ্চভ বলেছিলেন : ‘‘আমরা (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ, আমরা যদি শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হই, তবে কোন যুদ্ধই হতে পারে না। তখন যদি কোন উন্মাদ যুদ্ধ চায়, তাকে সতর্ক করে দিতে আমাদের অঙ্গুলি হেলনই হবে যথেষ্ট।’’কোথায় গেলো লেনিনের তত্ত্ব যাতে বলা হয় যুদ্ধ হচ্ছে অন্যরূপে রাজনীতিরই ধারাবাহিকতা! মার্কসবাদী তত্ত্বের এটা তো গোড়ার কথা যে রাজনীতি শেষপর্যন্ত সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কের নির্যাস আর তার ফলে যতদিন সমাজে শ্রেনীশোষণ ভিত্তিক অর্থনীতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন রাজনৈতিক সংগ্রাম ও যুদ্ধের অস্তিত্ব থাকবে এবং এটি হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ একটি নিয়ম। কোথায় গেলো ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধের পার্থক্য তথা দেশ দখলের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সাথে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের পার্থক্য! প্রথমদিকে এই অধঃপতিত সোভিয়েত নেতৃত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সখ্যতার পথে হাটলেও পরবর্তীতে সে নিজেই পরমাণু অস্ত্রে সর্বাধিক বলীয়ান হয়ে ওঠে এবং সোভিয়েত ভেঙে পড়বার আগে পর্যন্ত মার্কিণী শক্তির সাথে বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতা চালিয়ে যায়।

অবশ্য অধঃপতিত সোভিয়েতের এরকম সুবিধাবাদী মতবাদ তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চীন মেনে নেয়নি। তারা সোভিয়েত পার্টির সাথে এ নিয়ে এক দীর্ঘ বিতর্ক চালায় যা আন্তর্জাতিক মহাবিতর্ক নামে বিখ্যাত। চীন সমাজতন্ত্রের নেতৃবৃন্দ বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে দেখায় যে যতদিন বিশ্বে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে, শোষক ও নিপীড়িত জাতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তাদের মধ্যে সংগ্রামও থাকবে আর ততদিন বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা সহ অন্যান্য নানান ধরনের যুদ্ধের অস্তিত্ব থাকবে - সব ধরনের যুদ্ধ পৃথিবী থেকে একমাত্র তখনই বিলুপ্ত হবে যখন এক শ্রেণী কর্তৃক আর এক শ্রেণীর শোষণের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে। এহচ্ছে মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ একটি নিয়ম, এর সাথে পরমাণু বোমার মতো বিশেষ মারণাস্ত্র আবিস্কারের কোন সম্পর্ক নেই। তাই সোভিয়েতের ঐ বক্তব্য বৃহৎ শক্তিসুলভ পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল ছাড়া আর কিছুই নয়। সোভিয়েত অধঃপতিত হবার পর প্রায় ২০ বছর ধরে চীনের নেতৃত্ব নিজেরা পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান হয়েও নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে পরমাণু শক্তি দম্ভের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যান। তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চীনের নেতৃত্ব ঘোষনা করেছিল : ‘পারমাণবিক অস্ত্রের উপর বৃহৎ শক্তিগুলির একচেটিয়া অধিকারকে ভাঙা, বড় ও ছোট - সকল দেশের সমানাধিকার অর্জন, এবং শেষ পরিণতি হিসাবে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রের হাত থেকে রেহাই পাওয়াই চীনের লক্ষ্য।’ আর এর সাথে তুলনা করুন ভারত বা পাকিস্থানের শাসকদের ভূমিকা যারা কিনা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েই তড়িঘড়ি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের কাছে মুচলেকা পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে বিংশ শতাব্দীর ৮০’র দশক থেকে চীন সরকার দেশের অভ্যন্তরে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অধীনে শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ও আন্তর্জাতিকতাবাদ তথা দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থনের নীতি থেকে সরে গেছে। বর্তমানে সে সমাজতন্ত্রের পথে নেই, কেবল তাই নয়, সে পুঁজিবাদী শিবিরের এক বৃহৎ অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেছে।

পরমাণু শক্তি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন

আগে আমরা পরমানু অস্ত্র সংক্রান্ত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলাম। পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করবার প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। কয়লা, তেল বা গ্যাস থেকে যে পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় নিউক্লিয়ার প্লান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতির সাথে তার কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। খালি এক্ষেত্রে টারবাইন ঘোরানোর জন্যে তাপের উৎস হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিভাজন প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াতে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে তা অন্য দুটি মৌলের নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয় আর এই প্রক্রিয়াতে কিছু পরিমান ভর লুপ্ত হয়ে বিপুল পরিমান তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এই পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়া বোমা বানানোর ক্ষেত্র অনিয়ন্ত্রিত ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত।

১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সহ আরও বহু দেশে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর তৈরী করা হয় যার লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয় বিদ্যুত উৎপাদন। উন্নত দেশগুলিতে প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করে। ফ্রান্সে মোট বিদ্যুতের একটি বড় অংশ আসে এই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর থেকে। কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে পরিবেশকে তেজস্ক্রিয় করে তোলার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনের ফলে সেখানে পারমাণবিক চুল্লি বসানোর প্রবণতা ক্রমাগত কমে আসছে। প্রসঙ্গত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালের পর কোন পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র গড়ে তোলা হয় নি। ডেনমার্ক সরকার ১৯৮৫ সালে আইন করে সে দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন নিষিদ্ধ করেছে।

কিন্তু এই পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে আমাদের কিছু সত্যি কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন ;

১) নিউক্লিয়ার প্লান্টে জ্বালানী হিসাবে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করবার পর বর্জ্য পদার্থ হিসাবে যা বেরিয়ে আসে তার মধ্যে থাকে প্লুটোনিয়াম। প্লুটোনিয়াম পরমানু বোমা তৈরীর মশলা। মাত্র ৮ কেজি প্লুটোনিয়াম দিয়ে নাগাসাকিতে যে পরমানু বোমা ফেলা হয়েছিল সেরকম বোমা বানানো যায়। কেবল ২০০০ সালেই যত প্লুটোনিয়াম তৈরী হয়েছে তা দিয়ে

৩৪,০০০ পরমানু অস্ত্র বানানো যায়। ইউরেনিয়াম খনি প্রতিষ্ঠা ও তার রিফাইনিং এবং বর্জ্য হিসাবে প্লুটোনিয়াম উৎপাদন পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক। এগুলিতে যে রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে তা বাতাস, স্থলভূমি, জলভূমি, উদ্ভিদ দূষিত হয় যা মানুষ ও সমগ্র পরিবেশের পক্ষে বিরাট ক্ষতিকর। আর এই রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থের জীবনকাল সাংঘাতিক রকম বেশী। বিশেষত প্লুটোনিয়াম-২৩৯ পদার্থটি তৈরী হবার পরে ২৪০,০০ বছর ধরে পরিবেশকে দূষিত করে চলে। এককেটা রিঅ্যাক্টর বছরে প্রায় ২০ থেকে ৩০ টন বর্জ্য তৈরী করে। এই বর্জ্য যতদিন না নিজে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে ততদিন একে সুরক্ষিত রাখবার কোন পদ্ধতি আজও আবিস্কৃত হয়নি।

২) নিউক্লিয়ার প্লান্টের দুর্ঘটনা যে কি বিপজ্জনক হতে পারে তার প্রমান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের থ্রী মাইল আইল্যান্ড ও রাশিয়ার চেরনোবিল। থ্রী মাইল আইল্যান্ডে পাম্প নষ্ট হওয়ার জন্য, বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। বহু মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি আশপাশের সমস্ত জনবসতি একেবারে খালি করে দিতে হয়। ১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চের্নোবিলে একটি ইউনিটে বিস্ফোরণ ঘটে যাতে সাথে সাথে ৩০ জনের মৃত্যু হয় এবং কয়েকশ মানুষ তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়। প্রায় ১ লক্ষ মানুষকে সরিয়ে নিতে হয় । কয়েক হাজার মানুষের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। এতো গেল বড়ো বড়ো দুর্ঘটনার কথা। এছাড়াও অজস্র ছোটখাটো দুর্ঘটনা সারা বছর ধরে ঘটতেই থাকে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারীভাবে এগুলি চেপে যাওয়া হয় [২]।

৩) পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোন গ্রীনহাউস গ্যাস তথা কার্বন গ্যাস তৈরী হয় না এটি একটি নির্ভেজাল মিথ্যা। পরমাণু বিভাজন বিক্রিয়াতে কোন গ্যাস তৈরী হয় না একথা ঠিক, কিন্তু পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরী করা বলতে কেবল এই বিক্রিয়াকেই বোঝায় না, এর সাথে আরও নানান ধাপ আছে। যেমন খনি থেকে ইউরেনিয়াম আকরিক উত্তোলন, ইউরেনিয়াম আকরিক পরিস্কার করা, আকরিক থেকে ইউরেনিয়াম নিস্কাষণ ও চুল্লীতে সেটি নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াতে প্রচুর পরিমাণে শক্তি খরচ করতে হয় এবং তা করতে বহুল পরিমাণে খনিজ তেল জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফলস্বরুপ প্রচুর পরিমানে কার্বন গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। হিসাব করে দেখা গেছে যে পরমাণু চুল্লীতে খুব ভালো মানের ইউরেনিয়াম আকরিক ব্যবহার করলে উৎপন্ন কার্বন গ্যাসের পরিমাণ সম পরিমাণ তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে নির্গত কার্বন গ্যাসের অর্ধেক। আর যদি প্রতি টন আকরিকে ০.০২ শতাংশ খাটি জ্বালানী থাকে তাহলে উভয়ক্ষেত্রে একই পরিমাণ কার্বন গ্যাস নির্গত হয়।

৪) পরমানু শক্তিকেন্দ্রের উৎপাদন ঠিকঠাক থাকলেও পুঁজি বিনিয়োগের হিসাবে কয়লাচালিত শক্তিকেন্দ্রের তুলনায় এতে প্রায় ২৬ গুন বেশি খরচ হয়। এছাড়াও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মক্ষমতা অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় দ্রুত হ্রাস পায়। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর তৈরী করতে যা খরচ, এটি বাতিল করতেও প্রায় ততটাই খরচ পড়ে।

ভারতে পারমাণবিক গবেষণা

ভারতে পারমাণবিক গবেষণা সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে ভারত অপ্সরা নামে তার প্রথম গবেষণামূলক রিঅ্যাক্টর তৈরী করে। ১৯৬৯ সালে মার্কিণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারাপুরে প্রথম নিউক্লিয়ার বা পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র তৈরী হয়। এর পর পর বিভিন্ন জায়গায় আরও কিছু পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র গড়ে ওঠে। বর্তমানে আমাদের দেশে ১৫টি পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র চালু আছে। আরও ৮টি পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র গড়ার কাজ চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭৪ সালে ভারত পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বোমা তৈরীর সক্ষমতা অর্জন করবার পর মার্কিণ নেতৃত্বে পরমাণু জ্বালানী সরবরাহকারী দেশগুলি পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি (এন পি টি) অনুযায়ী পরমাণু জ্বালানী সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এরপরে নিজেদের সামান্য জ্বালানী ও মূলত রাশিয়ার সাহায্যের উপর নির্ভর করে পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্রগুলি চলতে থাকে। দেশীয় গবেষণাকে উৎসাহিত করে দেশীয় বিজ্ঞানীদের কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি যে নিজেরাই গড়ে তোলা যায় তা অল্প পরিমানে হলেও পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে প্রমানিত হয়েছে। যেহেতু পরমাণু গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ক প্রযুক্তি সহজলভ্য নয় তাই এক্ষেত্রে ভারতে দেশীয় কিছু গবেষণা হয়েছে ও তাতে কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পরমাণু সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি ত্রিস্তরীয় পদ্ধতি আবিস্কার করার পথে অনেকটাই এগিয়েছেন যার লক্ষ্য হচ্ছে যে ভারতে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বেশি পরিমানে না পাওয়া গেলেও এই ত্রিস্তরীয় পদ্ধতিতে প্রথম স্তরে অল্প ইউরেনিয়াম দিয়ে শুরু করে পরবর্তী স্তরে থোরিয়ামকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা। প্রসঙ্গত ভারতে থোরিয়ামের বিরাট ভান্ডার রয়েছে। প্রথম স্তরের কাজ ইতিমধ্যেই সফলতা পেয়েছে এবং প্রথম স্তরের বর্জ্য থেকে উৎপন্ন প্লুটোনিয়াম দ্বিতীয় স্তরে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবার প্রকল্পও অনেকদূর এগিয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে যে পরিমান প্লুটোনিয়াম ব্যবহৃত হবে তার থেকে বেশি পরিমান প্লুটোনিয়াম বর্জ্য হিসাবে উৎপাদিত হবে ও তার সাথে সাথে দ্বিতীয় স্তরে প্লুটোনিয়াম জ্বালানীর আবরণ হিসাবে ব্যবহৃত থোরিয়ামের চাদরও জ্বালানী ইউরেনিয়ামে রুপান্তরিত হবে। দ্বিতীয় স্তরে উৎপাদিত এই ইউরেনিয়াম জ্বালানী তৃতীয় স্তরের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হবে যেখানে কেবল বিদ্যুতই উৎপাদিত হবে না এই প্রক্রিয়া থোরিয়ামকেও আবার জ্বালানী ইউরেনিয়ামে রুপান্তরিত করে নিজের জ্বালানী নিজেই তৈরী করে নেবে। বলা হয় যে এই তৃতীয় স্তরের কাজটি সমাপ্ত না হলেও গবেষণার কাজে

বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছে। ফলে এই গোটা প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ছাড়াই সহজলভ্য থোরিয়ামকে ব্যবহার করে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়ে ওঠা [৩]।

ভারতে পারমাণবিক গবেষণার চালিকাশক্তি

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে দেশের প্রায় কোন মৌলিক সমস্যা সমাধান করবার আগেই পরমাণু গবেষণা শুরু করে দেওয়া হয় আর এ ব্যাপারে বিরাট গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। একটু আগে আমরা তো পরমাণু বিদ্যুতের আসল হিসাব নিকাশ দেখলাম। স্বাভাবিকভাবেই যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে ব্যাপক জনগণের স্বার্থের কথা ধরলে আমাদের মতো দেশে প্রাথমিকভাবে এ ধরনের গবেষণাতে জোর দেবার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নি। তা হলে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে ভারত সরকার তথাপি এর পেছনে কেন এত টাকা খরচ করছে যেখানে আমাদের দেশে রয়েছে বিরাট আর্থিক সমস্যা, ভূমি সম্পর্ক অত্যন্ত অসমান, বিরাট সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, সমস্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য তৈরী হয় না, মানুষের জন্য সামান্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়নি, আধুনিক চিকিৎসা তো দূর অস্ত। আসলে এর উত্তর পাওয়া যাবে ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে বেড়ে উঠেছে, তাদের সাথে ব্রিটিশ শাসকদের কি ধরণের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে, ব্রিটিশ ভারতে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা ইত্যাদি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। ইতিহাস বলে যে ব্রিটিশ ভারতে যে দুটি শ্রেণী ব্রিটিশ দাক্ষিন্যে জনগণকে শোষণ করে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় তারা হচ্ছে জমিদারশ্রেণী ও একটি এলিট ব্যবসায়ীশ্রেণী ও পরবর্তীতে এদের মধ্যে থেকে উদ্ভুত বৃহৎ শিল্পপতি গোষ্ঠী যারা প্রযুক্তি ও পুঁজির জন্য বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির উপর নির্ভরশীল। এর সাথে সাথে ব্রিটিশ ও এই দুটি শ্রেণীর স্বার্থের সেবক হিসাবে গড়ে ওঠে একটি শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণী যারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ব্রিটিশ স্বার্থের সেবা করতো। আর এর প্রতিদানস্বরুপ তারা যে সব সুযোগ সুবিধা পেয়েছে তাতে তারা নিজেদের ইউরোপের উন্নত দেশগুলির মতো করে নিজেদের জীবনযাত্রা চালাতে ও সেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। দেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক বিজ্ঞান চর্চা গড়ে তুলে তাদের সৃজনী শক্তির উপর ভিত্তি করে দেশের অর্থনীতি ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো কখনই এদের লক্ষ্য ছিল না। বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণাকে এরা কেবল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সোপান হিসাবে দেখে যাতে বিদেশী প্রযুক্তি ও বিদেশী পণ্যের ভোগকে ও বিদেশ যাত্রাকে নিশ্চিত করা যায়। ফলে ভারতবর্ষে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ব্যাপক মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও দেশের উপযোগী বিজ্ঞান গবেষণা বিস্তারের চেয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করা ও সেইসব সংক্রান্ত গবেষণার সাথে যুক্ত থাকার লক্ষ্যে তারা বরাবরই সরকারের পলিসিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। পরমাণু গবেষণা এই এলিট শ্রেণীর একটি অংশের হাতে প্রভূত সরকারী অর্থ খরচ করা, বিদেশে ভ্রমন করা ইত্যাদির সুযোগ এনে দিয়েছে। আবার অন্যদিকে আমাদের শাসকেরা কোন না কোন বড় শক্তির প্রতি অনুগত থাকার পাশাপাশি অন্যান্য অনেক দেশের শাসকদের মতোই পরমানু শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে চেয়েছে কারণ তাতে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

ভারত মার্কিণ পরমাণু চুক্তি

ভারত মার্কিণের মধ্যে পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত যে চুক্তি হওয়ার পথে তা ১২৩-চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে ভারত পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে সই না করা সত্বেও পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরী করবার জন্য জ্বালানী ও পরমাণু প্রযুক্তি আমদানী করতে পারবে। চুক্তির শর্তানুযায়ী ভারতের ২২টি পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্রের ১৪টি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রত্যক্ষ নজরদারীর আওতায় আসবে। চুক্তির ৪ নং অনুচ্ছেদে নিউক্লিয়ার দ্রব্য নিয়ে বানিজ্যের বিষয়টি রয়েছে। দুই দেশ অবাধে নিজেদের মধ্যে, এবং প্রয়োজনে, তৃতীয় একটি বা কয়েকটি দেশের সাথে নিউক্লিয়ার বিষয়ে বাণিজ্য চালাতে পারবে। কিন্তু এই ১২৩-চুক্তি কার্য্যকরী থাকাটা ১৯৫৪ সালে তৈরী হওয়া মার্কিণ দেশের অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্টের অধীন। মার্কিন সেনেটর হাইড ২০০৫ সালে (বিশেষতঃ ভারত- মার্কিণ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে) এই আইনটিকে আরও কঠোর করবার পর এটার নাম হয় হাইড আইন। হাইড আইনের প্রধান বিষয়বস্তুগুলি হচ্ছে যে

ক) পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কিত পরীক্ষা বা বিস্ফোরণমূলক কাজ করলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একতরফা এই চুক্তি বাতিল করে দিয়ে সমস্ত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ফিরিয়ে নিতে পারবে।

খ) যে ১৪টি পরমাণু শক্তিকেন্দ্র আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার নজরদারীর আওতায় আসবে সেটা চুক্তি বজায় থাকুক আর না থাকুক তেমনই থাকবে।

গ) ভারত নিউক্লিয়ার প্লান্টে ব্যবহৃত জ্বালানী পুনর্ব্যবহার করতে পারবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্যবহৃত জ্বালানী থেকেই প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায় যা বোমা তৈরীর মূল উপাদান।

ঘ) ভারতকে মার্কিণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রসারণ রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি কোন নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিতে সক্ষম দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় তবে তাকে সমর্থন করতে হবে।

ভারতের নিজস্ব পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তাদের আবিস্কৃত ত্রিস্তর প্রক্রিয়াতে জ্বালানীর পুনর্ব্যবহার একটি আবশ্যিক অঙ্গ, কারণ উপজাত প্লুটোনিয়ামকে ব্যবহার করেই দ্বিতীয় স্তরে থোরিয়ামকে জ্বালানী ইউরেনিয়ামে

রুপান্তরিত করা হবে। কিন্তু প্লুটোনিয়াম যেহেতু বোমা তৈরীরও মূল উপাদান তাই এই চুক্তি এক কলমের খোঁচায় দেশীয় গবেষণাকে বস্তুত বাতিল করে দিয়েছে।

মনে রাখা দরকার যে এই আইনে ভারতকে কি কি নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে এবং সেগুলি না মানলে তার বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটাই বিবৃত আছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলে চুক্তির কি হবে সে নিয়ে কোন ধারা নেই। এর পরিস্কার অর্থ যা দাড়ায় তা হচ্ছে যে মার্কিণ সরকার নিজের ইচ্ছামতো ভারতকে সহায়তা করতে পারে বা তার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে, কিন্তু ভারত যে ধরনের আচরণই পাক না কেন তার কারণ জানার অধিকার ভারতের থাকবে না।

চুক্তির পেছনে মার্কিণী পরিকল্পনা

তবে ভারতবর্ষের সাথে আমেরিকার যে পরমাণু চুক্তি তৈরী হয়েছে তার পেছনে রয়েছে মুলতঃ তিনটি মার্কিণী পরিকল্পনা। সে তিনটি হলো যথাক্রমে ;

(১) মার্কিণ সরকার তার বিশ্ব আধিপত্য তথা দক্ষিন এশিয়া ও বিশেষত আরব অঞ্চলের তেলের উপর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ভারতকে তার আগ্রাসী সামরিক নীতির সাথে জুড়ে নিতে চায়।

(২) মার্কিণী বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি পরমাণু জ্বালানী ও টেকনোলজি নিয়ে ভারতে বড় আকারে ব্যবসা করতে চায়।

(৩) ভারতের পরমাণু অস্ত্র তৈরী করবার অধিকারকে মার্কিণী শক্তির স্বার্থের নিয়ন্ত্রনে রাখা।

(৪) এশিয়াতে চীনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে ভারতকে মার্কিণ স্বার্থের পক্ষে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে মদত করা।

আগ্রাসী সামরিক নীতির সাথে ভারতকে জুড়ে নেবার লক্ষ্যে অনেক আগে তথা সেই বিজেপি-র আমল থেকেই আতঙ্কবাদ দমনের নামে সামরিক ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিণ সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। দিল্লীতে এমনকি মার্কিণ গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি আই-কে অফিস খুলতে দেওয়া হয়েছে। ইরাক দখলের অন্যায় যুদ্ধে রত মার্কিণী বিমানে তেল ভরতে ভারত সহযোগিতা করেছে। এশীয় অঞ্চলে খবরদারী করবার জন্য বর্তমানে মার্কিণ সামরিক বাহিনীকে ভারতীয় নৌ-বন্দরগুলি ব্যবহার করবার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে চেন্নাই বন্দরে একটি মার্কিণ যুদ্ধ জাহাজ ৫ দিন অবস্থান করে এবং এই জাহাজের ৫০০০ মার্কিণ সেনা চেন্নাই সহরে কোন লিখিত অনুমতি ছাড়াই অবাধে সহরে বেআইনীভাবে ঘোরাঘুরি করে। এব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান যে এটি একটি রুটিন মাফিক ঘটনা। প্রসঙ্গত পরমাণু চুক্তির আগেই ২০০৫ সালের জুন মাসে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রনব মুখার্জী ও মার্কিণ প্রতিরক্ষা সচিব রামসফেল্ডের মধ্যে ভারত মার্কিণ প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পন্ন হয়। এর সাথে সাথে সম্প্রতি যৌথ বিমান মহড়াও শুরু হয়েছে। ২০০৫ সালে খোদ পশ্চিমবঙ্গে কলাইকুন্ডাতে এরকম মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে ভারতকে আগ্রাসী সামরিক পরিকল্পনার শরিক করে নেবার ব্যাপারে মার্কিণ শাসকেরা অনেকটাই সফলভাবে এগিয়ে গেছে।

মার্কিণী ও বিশ্বজনগণের পরমাণু প্রকল্প ও পরমাণু অস্ত্র বিরোধী সংগ্রামের চাপে এবং পরমাণু বিদ্যুৎ বানিজ্যিকভাবে খুব সফল না হবার জন্য আমেরিকাতে ১৯৭৩ সালের পরে আর পরমাণু বিদ্যুত কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াতে যে ভাবে মুনাফাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সব কিছুকে বানিজ্যের অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে তার সাথে সঙ্গতি রেখেই বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে আবার পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরমাণু টেকনোলোজি নিয়ে বড় আকারে ব্যবসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। আর এর জন্যে আমেরিকার বিখ্যাত এম আই টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের নামানো হয়েছে। তারা **'নিউক্লিয়ার শক্তির ভবিষ্যত'** নামে একটি খসরা [৪] প্রকাশ করে বলতে চাইছেন যে যদিও নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে নির্গত বর্জ্য সংরক্ষন করবার ব্যবস্থা আবিস্কৃত হয় নি এবং দুর্ঘটনার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তা সত্ত্বেও গ্যাস বা কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন গ্রীনহাউস গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড) নির্গত করে পরিবেশের যে ক্ষতি করছে তা থেকে বাঁচায় উপায় হলো বেশি বেশি করে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। আর যেহেতু নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ বেশি তাই তারা প্রস্তাব করেছেন যে গ্যাস ও কার্বন ব্যবহারের উপর আরও বেশি করে ট্যাক্স বসিয়ে পরমাণু বিদ্যুতকে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক করা যেতে পারে, আর তা হলে ব্যবসায়ীরাও দেশে বিদেশে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে আগ্রহী হবে। এইভাবে এরা বিশ্বজনগণের অতিরিক্ত গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন ও তার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে সঠিক উদ্বেগকে বিপথে পরিচালনা করবার চেষ্টা করছে। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের গোটা প্রক্রিয়াটা ধরলে সেখানেও যে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হয় সেটা বেমালুম চেপে গিয়ে অতি মুনাফার লক্ষ্যে নিউক্লিয়ার সংক্রান্ত ব্যবসার প্রসারণ ঘটাতে চাইছে।

আর এই লক্ষ্যে একটি মার্কিণ ব্যবসা সংস্থা উদ্যোগ নিয়েছিল যাতে ভারত-মার্কিণ পরমাণু চুক্তি বিলটি তাড়াতাড়ি মার্কিণ কংগ্রেসের অনুমোদন পেয়ে যায়। ২০০৬ সালের নভেম্বরে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি ''আমেরিকান কোম্পানীগুলির ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।'' এর মধ্যেই মার্কিণ সহ সচিবের সাথে জেনারেল ইলেকট্রিক এনার্জি, নিউক্লিয়ার এনার্জি ইনস্টিটিউট সহ ২০টি বৃহৎ নিউক্লিয়ার বানিজ্যসংস্থার ২২৫ জন প্রতিনিধি নিউক্লিয়ার জ্বালানী ও প্রযুক্তি নিয়ে ব্যবসার জন্য ভারতে ঘুরে গেছে। তাদের হিসাবে এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে

এখনই ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থের বানিজ্য সম্ভব হবে [৫]। আর মধ্যস্থকারী ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতের টাটা ও রিলায়েন্স ইতিমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা এব্যাপারে ভারতীয় আইন বদলানোর জন্য উদ্যোগও নিয়েছে। তাই ভবিষ্যতে কেবল আমেরিকার রাজনৈতিক স্বার্থের সেবাই নয়, ভারতের নিউক্লিয়ার সংক্রান্ত বাজারটিও দখল করে দেশের মানুষের বিপুল উদ্বৃত্ত লুঠ করবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজি আর এই লুন্ঠনে সহযোগিতার পুরস্কার হিসাবে কিছু দেশীয় কোম্পানীও ঐ উদ্বৃত্তে ভাগ বসাবে।

পরমাণু শক্তিতে বলীয়ান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই চেয়েছে যে সে ছাড়া আর কারোর হাতে বিশেষতঃ অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র না থাকুক কারণ তা হলেই পরমাণু অস্ত্রের জুজু দেখিয়ে সে তাদের ব্ল্যাকমেল করতে পারবে। কিন্তু তার এই বাসনা পূর্ণ হয় নি। উপরন্তু পরবর্তীতে চীন, ভারত ও পাকিস্থান নিজেরাই বোমা বানানোর কৌশল রপ্ত করেছে। এমতাবস্থায় সে এশিয়াতে তার আধিপত্য বজায় রাখতে অনেকদিন ধরেই ভারতকে কব্জা করতে চাইছে এবং এক্ষেত্রে সে ভারতের পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত কিছু দাবীদাওয়াও মেনে নিতে প্রস্তুত যদি ভারত মার্কিনী বৈদেশিক পরিকল্পনার একটি নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসাবে কাজ করে। গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় শাসকেরা বিভিন্নভাবে মার্কিনী শাসকদের কাছে তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। হাইড আইনের আসল মর্মবস্তু সেটাই এবং ভারতের বর্তমান শাসকেরা এটা মেনে নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ভারত - মার্কিণ পরমাণু চুক্তি ও কিছু সত্য

বর্তমানে ভারত সরকার যে বিষয়টা তুলে ধরতে চাইছে তা হচ্ছে আমাদের দেশে যে কয়লা মজুত আছে তা খুব শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে এবং সেই কারণে মানুষের বিদ্যুত উৎপাদনের চাহিদা মেটাতে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষ জরুরী হয়ে উঠেছে। আর ভারতে যেহেতু পরমাণু জ্বালানী সহজলভ্য নয় তার জন্য আমেরিকার সাথে চুক্তি করা দরকার। চুক্তি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারী এমন প্রকট হয়ে পড়ে যে ২০০৫ সালের ১৭ই জুলাই মনমোহন সিং-কে বলতে হয়েছিল, ''আমরা হচ্ছি স্বাধীন শক্তি, আমরা কোন দেশের লেজুড় রাষ্ট্র নয়, তথা আমরা কারোর করুণাপ্রার্থীও নই । দুটো সমান রাষ্ট্র (ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র) হিসাবে আমরা যে ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের যৌথ স্বার্থ জড়িয়ে আছে সেগুলি খুঁজে বের করতে পারি এবং একত্রে কাজ করতে পারি।'' সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিব্বল কলকাতায় এসে বলেছেন, ''ওঁরা বুশের সঙ্গে বিদ্যুৎ গুলিয়ে ফেলছেন। আমরা বুশের রাস্তায় হাঁটছি না। বরং আমরা দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চাই। বামপন্থীরা সেই রাস্তা অবরোধ করছেন।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৭) এবার আমরা এক এক করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করবো।

১) বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান এখনও পর্যন্ত পরমাণু প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে সম্ভব নয়।

বিদ্যুতের ব্যাপারে আমরা একটু পুরনো ইতিহাস ঘেটে দেখতে পারি। ১৯৬২ সালে ভারতের পরমাণু কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠাতা হোমি ভাবা আশা করেছিলেন যে ১৯৮৭ সাল নাগাদ আমরা পরমাণু বিদ্যুত কেন্দ্র থেকে ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত পাবো। তার উত্তরসূরী ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটোমিক এনার্জি-র প্রধান বিক্রম সারাভাই বলেছিলেন যে ২০০০ সাল নাগাদ পরমাণু কেন্দ্র থেকে বিদ্যুত সরবরাহের পরিমান দাড়াবে ৪৩,০০০ মেগাওয়াট। গত পঞ্চাশ বছর ধরে পরমাণু গবেষণাতে বিরাট পরিমান অর্থ ব্যয় করে বর্তমানে আমরা মাত্র ৩৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকি যা আমাদের মোট সরবরাহের ২ শতাংশের কাছাকাছি। বর্তমানে ডিপার্টমেনট অব অ্যাটোমিক এনার্জি ভারত-মার্কিণ পরমাণু চুক্তি করে যে ২০২০ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুত উৎপাদনের কথা বলছে তা মোট বিদ্যুতের চাহিদার ৮ থেকে ১০ শতাংশের বেশি হবে না [৩,৬]।

আমেরিকার সাথে পরমাণু চুক্তি করবার ব্যাপারে যে যুক্তিটিকে সামনে রাখা হচ্ছে তা হচ্ছে পরমাণু বিদ্যুৎ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। আর যেহেতু আমাদের দেশে খুব কম পরিমান পরমাণু জ্বালানী তথা ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় এবং সেই কারণেই জ্বালানী না পাওয়া গেলে এগুলি বন্ধ করে দিতে হতে পারে। কিন্তু মজার কথা হলো যে বিদ্যুতের সরবরাহের কোণ থেকে দেখলে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে পরমাণু কেন্দ্রগুলি নিকট ভবিষ্যতে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

২) মজুত কয়লা ফুরিয়ে যাওয়া নিয়ে মিথ্যা প্রচার।

দেশের মজুত কয়লা খুব তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ৪/৫ দশকের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে বলে যে প্রচার করা হচ্ছে তা যে সর্বৈব মিথ্যা তা সরকারী হিসাব দিয়েই দেখানো যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের কয়লা মন্ত্রকের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ভারতে কয়লার ২৫৩.৩ বিলিয়ন টন। এর মধ্যে ৯৬ বিলিয়ন টন পাওয়া যাবেই এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ১২০ বিলিয়ন টন পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে ব্যবহৃত মোট

- ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভবিষ্যত চিত্র -

বছর	পরমাণু	জল	খনিজ তেল	প্রাকৃতিক গ্যাস	কয়লা	মোট
০৩-০৪	৫	৭	১১৯	২৯	৩২৭	৩২৭
	২%	২%	৩৬%	৯%	৫১%	১০০%
০৬-০৭	৭	৯	১২৫	৩৬	২০৪	৩৮১
	২%	২%	৩৩%	৯%	৫৪%	১০০%
১১-১২	১৫	১৫	১৫৭	৫২	২৬৯	৫০৮
	৩%	৩%	৩১%	১০%	৫৩%	১০০%
১৬-১৭	২৯	১৯	২০১	৭৫	৩৬০	৬৮৪
	৪%	৩%	২৯%	১১%	৫৩%	১০০%
২১-২২	৫৪	২৪	২৫৯	১০৮	৪৫৬	৯০১
	৬%	৩%	২৯%	১২%	৫১%	১০০%
২৬-২৭	৭৯	৩৪	৩৩৪	১৫৫	৬৩২	১২৩৪
	৬%	৩%	২৭%	১৩%	৫১%	১০০%
৩১-৩২	১১৫	৪৩	৪৩৫	২২৪	৮১৬	১৬৩৩
	৭%	৩%	২৭%	১৪%	৫০%	১০০%

(এখানে একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে প্রতি মিলিয়ন টন তেল থেকে পাওয়া বিদ্যুতের পরিমাণকে। যেমন ২০০৩-২০০৪ সালে পরমাণু বিদ্যুতের পরিমান ৫ একক বলতে বোঝানো হচ্ছে যে পরমাণু বিদ্যুৎ যতটা পাওয়া যায় তা ৫ মিলিয়ন টন তেল থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের সমতুল্য।)

(উৎস : ড্রাফট রিপোর্ট অফ দি এক্সপার্ট কমিটি অন ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি পলিসি, প্লানিং কমিশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া)

বিদ্যুতের ৫৪% সরবরাহ আসে মূলত তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র থেকে আর সেজন্য বাৎসরিক যে পরিমাণ কয়লা লাগে তা হচ্ছে ০.৩৫ বিলিয়ন টন। ফলে বছর বছর বিদ্যুতের চাহিদা বাড়বে এটা ধরে নিয়েও দেখানো যায় যে আমাদের দেশে যে কয়লা মজুত আছে তা দিয়ে সহজেই ২০০ বছরেরও বেশি সময় চালানো যাবে [৭]। মজার ব্যাপার হলো প্লানিং কমিশন ভবিষ্যতের যে হিসাব দেখাচ্ছে [৮] তাতে ২০২৬ - ২০২৭ সময়কালে ও ২০৩১ - ২০৩২ সময়কালেও পরমাণু বিদ্যুত মোট বিদ্যুতের মাত্র ৬ থেকে ৭ শতাংশ চাহিদা পূরণ করবে এবং ৫০ শতাংশেরও বেশি আসবে সেই কয়লা থেকেই। আর ভারত-মার্কিণ পরমাণু চুক্তি বাস্তবায়িত হলে ২০২০ সাল নাগাদ পরমাণু বিদ্যুৎ ৭ শতাংশের বদলে ১০ শতাংশ চাহিদা পূরণ করতে পারে। যেহেতু বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েই চলবে (সারণীটি দেখুন), তাই আগামী ৪০ বছরে সঞ্চিত কয়লা ফুরিয়ে যাবে এটি সত্যি ধরে নিলে সরকারী হিসাবেই তা পূরণ করবার ক্ষমতা পরমাণু বিদ্যুতের একেবারেই নেই। ফলে পরমাণু শক্তির পেছনে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করেও বেশীর ভাগ মানুষকে অন্ধকারেই থাকতে হবে কারণ মোট বিদ্যুতের চাহিদার ৫০ শতাংশের উৎস চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে ও প্লানিং কমিশনের হিসাব অনুযায়ীই অন্যান্য উৎস থেকেও উৎপন্ন বিদ্যুতের হারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। এই যদি আসল চিত্র হয় তাহলে পরমাণু বিদ্যুতের কথা বলে মানুষকে বোকা বানানোর উদ্দেশ্য কি! আসলে বিশ্বায়নের যুগে মুনাফার উদ্দেশ্যে জনগণকে বোকা বানানোর যে সর্বনাশী খেলা শাসকেরা শুরু করেছে একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে বিচার করলেই তার ভ্রান্ত প্রচারের মুখোশটাকে খুলে দেওয়া যায়।

৩) দেশীয় গবেষণার অগ্রগতির সাথে এই চুক্তির সম্পর্ক নেই

আমরা আগেই বলেছি যে যেহেতু পরমাণু গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ক প্রযুক্তি সহজলভ্য নয় তাই এক্ষেত্রে ভারতে দেশীয় কিছু গবেষণা হয়েছে ও তাতে কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আবিস্কৃত ত্রিস্তরীয় পদ্ধতিতে জ্বালানীর পুনর্ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু চুক্তির বয়ান অনুযায়ী ভারতের জ্বালানীর পুনর্ব্যবহারের অধিকার

থাকবে না কারণ জ্বালানী ব্যবহারের পরই প্লুটোনিয়াম তৈরী হয় যা বোমা তৈরীর মূল উপাদান। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই ত্রিস্তরীয় পদ্ধতিতে প্লুটোনিয়াম ব্যবহার আবশ্যক কারণ সেটা ব্যবহার করেই থোরিয়ামকে জ্বালানী ইউরেনিয়াম পরিনত করা যাবে।

এতদিন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আবিস্কারকে ভারতীয় বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতি হিসাবে হাজির করে কি নির্লজ্জভাবেই না চুক্তির এক কলমের খোঁচায় তাকে কার্যত খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে। যেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বানিজ্যসংস্থাগুলি পরমাণু জ্বালানী ও প্রযুক্তি নিয়ে ভারতে ব্যবসা করতে চাইছে, তৎক্ষনাৎ ভারত সরকারের চিন্তাভাবনা বদলে গেছে। এতদিন এই গবেষণার পেছনে জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচ করে এখন বোঝানো হচ্ছে যে আমাদের দেশে যেহেতু যথেষ্ট ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় না তাই চুক্তি না করলে আর কোন অগ্রগতি করা যাবে না। এখন বলা হচ্ছে যে কবে দেশীয় প্রযুক্তির সাফল্য অর্জন করে সত্যিই থোরিয়ামকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে তার উপর নির্ভর করে আমাদের বসে থাকলে চলবে না, আমাদের বিদেশী সাহায্য ও প্রযুক্তি নিয়েই এগিয়ে চলতে হবে। এই ঘটনার মাধ্যমে আর একবার বোঝা গেলো যে দেশীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ নয়, আমাদের শাসকেরা বিদেশী উন্নত প্রযুক্তি ও তা নিয়ে আমদানীর ব্যবসায় মধ্যস্থতার ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মুনাফার অর্জনের জন্য কেমন লালায়িত।

মার্কিনী স্বার্থে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন

সরকার অনেকদিন ধরেই বুশের তথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রস্তাবিত রাস্তায় হাটা শুরু করেছেন ও বর্তমানে তা একটি চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্বাধীন পরমাণু গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এমনকি ১২৩ চুক্তি ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাইড আইনের মিলিত সারমর্ম আসলে এন পি টি-তে স্বাক্ষর করার সামিল, পার্থক্য এই যে এক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা নির্ধারিত হবে সে কতটা মার্কিণ সরকারকে সন্তুষ্ট রাখতে পারছে তা দিয়ে।

১৯৮০'র দশকের শেষ দিক থেকে সোভিয়েতের ভেঙে পড়া ও বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতিতে মার্কিণী আগ্রাসন প্রকট হবার সময় থেকেই ভারত সরকার ক্রমান্বয়ে যে নীতি গ্রহন করে আসছে এই পরমাণু চুক্তিকে তার স্বাভাবিক ফলাফল হিসাবে ধরা যেতে পারে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সে ১৯৯০'র দশক থেকেই পশ্চিমী পুঁজির সমস্ত হুকুম তামিল করবার রাস্তা ধরেছে। আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে গ্যাট চুক্তিতে সই করে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাঁধা অপসারিত করেছে, আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকা শিল্প সংস্থাগুলিকে বন্ধ করেছে বা বেসরকারীকরণ করেছে, ব্যাঙ্ক ও বিমার বেসরকারীকরণ করেছে, দেশ থেকে বিদেশী পুঁজির বিশেষত ফাটকা পুঁজির ইচ্ছামত প্রস্থানের জন্য মুদ্রাকে পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করে তুলছে ও বর্তমানে সেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের ভেতর কিছু অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তুলছে যেখানে দেশের আইন বলবৎ হবে না, প্রযুক্ত হবে না কোন শ্রম আইন বা আয়করের নিয়ম কানুন। এইসবই ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়ে চলেছে ক্রমান্বয়ে কংগ্রেস সরকার, বাম সমর্থিত গুজরাল সরকার ও বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের আমলে। তবে অতি প্রত্যক্ষভাবে মার্কিণ রাজনীতির সাথে দেশকে বেঁধে ফেলার কাজটি শুরু করে এন ডি এ সরকার। আতঙ্কবাদকে মোকাবিলা করার নামে প্রত্যক্ষভাবে মার্কিণ ও ইসরায়েল ঘেষা রণনীতি চালু করে মার্কিণ সরকারের বিশ্ব রণনীতির সাথে নিজেকে সে বেঁধে ফেলে। বর্তমান কংগ্রেস সরকার সে প্রক্রিয়াকে গ্যাটচুক্তির স্থপতি মনমোহন সিং-এর মাধ্যমে চুড়ান্ত রুপ দিতে এগিয়ে চলেছে, আর পরমানু চুক্তি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিনতি।

১৯৭৪ সালে ভারত প্রথম সফলভাবে পরমানু বিস্ফোরণ ঘটায় যার পরে মার্কিণ ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলি নিউক্লিয়ার পণ্য যোগান দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। এখানে উল্লেখ্য যে ভারত ১৯৬৮ সালে তৈরী হওয়া এন পি টি (পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি) -তে স্বাক্ষর করেনি। এই চুক্তি অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের আগে যে দেশগুলি যথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও চীন, পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তাদের পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ও তারা বাদে বাকী স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে পরমাণু অস্ত্র অর্জন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। ভারত প্রথম থেকেই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছে এই যুক্তি দেখিয়ে যে তা পরমানু শক্তিধর দেশগুলির প্রতি পক্ষপাতমূলক। পরমানু শক্তিধর দেশগুলি বিশেষত আমেরিকা চাইছে না যে অন্য দেশগুলির হাতে পরমানু অস্ত্র থাকুক যেখানে তার হাতে গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করার মতো পরমানু অস্ত্র ইতিমধ্যেই মজুত রয়েছে। কিন্তু এমন কোন আন্তর্জাতিক নিয়ম নিশ্চয়ই থাকা উচিত নয় যেখানে অল্প কিছু দেশ অস্ত্র মজুত রাখবে ও অন্যদের সে অধিকার থাকবে না। নীতি হওয়া উচিত যে পরমানু শক্তিধর দেশগুলি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে তাদের অস্ত্র ধ্বংস করবে ও বাকীরা তৈরী করবে না। যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরমানু বোমা তৈরী করেছে কেবল নয়, বিশ্বজনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে জাপানে তা নিক্ষেপও করেছে তার কি অধিকার আছে যে ভারত, ইরাক বা ইরান পরমানু বোমা তৈরী করছে কি করছে না তা নিয়ে খবরদারী করবার। আপনার মনে হতে পারে যে অন্তত একটি সঠিক নীতির ভিত্তিতে ভারত সরকার এন পি টি - তে স্বাক্ষর না করে ঠিক কাজই করেছে । কিন্তু আসল সত্য হলো যে ভারত সরকার এরকম কোন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সত্যিই নেই।

বর্তমানে এই সত্য আরও পরিস্কার হয়ে গেছে যে ভারতীয় বড় পুঁজিপতি ও উচ্চমধ্যবিত্তের স্বার্থবাহী ভারত সরকারের কোন নীতির বালাই নেই। ভারত সরকারের নীতি হলো যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের সাথে যে আচরনই করুক না কেন সে যদি ভারতীয় পুঁজি ও উচ্চবিত্তকে কিছু সুযোগ সুবিধা দেয় তা হলে সে সমস্ত ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সমস্ত পদক্ষেপকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। বর্তমানে এলিট শ্রেণীর একটি অংশ ব্যাপক প্রচার চালিয়ে নির্লজ্জভাবে বলছে যে নীতিবাগিশ না হয়ে এই ধরনের নীতি গ্রহনই নাকি বিচক্ষণতার পরিচয়ের লক্ষন, ভারতের বিদেশনীতি নাকি এবার সঠিক দিকেই এগোচ্ছে।

ভারত সরকারের চরম নীতিহীনতার পরিচয় পাওয়া গেছে এন পি টি-তে স্বাক্ষরকারী ইরাণের পরমাণু গবেষণা সংক্রান্ত অধিকারের প্রশ্নে। পরমাণু অস্ত্র রোধ চুক্তি অনুযায়ী যে কোন স্বাক্ষরকারী দেশের ইউরেনিয়াম তথা পরমানু জ্বালানী সমৃদ্ধকরণের অধিকার আছে। ইরাণের এই অধিকার আছে কিনা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী লারপভ বলেন যে '' আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) -র নিয়ম অনুযায়ী এন পি টি-তে স্বাক্ষরকারী দেশের এই অধিকার আছে।''আর এর বিপরীতে মার্কিণ প্রতিরক্ষা সচিব রাইস বলেন, ''এটা অধিকারের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে যে জ্বালানী সমৃদ্ধকরণের ব্যাপারে ইরাণকে বিশ্বাস করা যায় কি যায় না।'' কি সাংঘাতিক কথা। কোন দেশের কি অধিকার থাকবে তা ঠিক হবে এমনকি বৈষম্যমূলক কোন আন্তর্জাতিক নীতি দিয়েও নয়, তা ঠিক হবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি মনে করে সেটা দিয়ে। আর মার্কিণের এই অন্যায় দাবীকে ভারত সরকারের মৌখিক সমর্থন মার্কিণ শাসকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি কমিশনে ইরানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তা প্রমান করতে হয়েছে যেখানে মার্কিণ সরকারের জেতার জন্য ভারতের ভোটটি আদৌ আবশ্যিক ছিল না [৯]। কিন্তু বাস্তবত আমেরিকা এই লোভী এলিটদের দালালীর জন্য যেটুকু প্রাপ্য দেওয়া উচিত ছিল তা দেয়নি, বরং ঘুরিয়ে তাকে এমন চুক্তি করতে বাধ্য করেছে যাতে আসলে মার্কিণ সরকার তাদের প্রয়োজন মতো ভারতের সাথে এন পি টি তে স্বাক্ষরকারী দেশের মতোই আচরন করতে পারবে। সরকার নানাভাবে এটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। হাইড অ্যাক্ট -এর বিষয়বস্তু প্রকাশ হয়ে পড়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে যে হাইড আইনের ১০৩ ধারায় অন্যান্য অনেক শর্তের সাথে এটাও বলা হয়েছে যে ইরানের পরমাণু কর্মসূচী বন্ধের জন্য ভারতকে মার্কিণ প্রশাসনের সাথে হাত মিলিয়ে প্রয়োজনে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আবার আমেরিকার অনিচ্ছা আছে এমন কোন নিউক্লয়ার গবেষণা করলেই ১২৩ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে যে চুক্তিতে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার নজরদারীর আওতায় ভারতকে নিউক্লিয়ার জ্বালানী ও নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি দেবার কথা রয়েছে। বিষয়টি এতটাই গুরুতর যে এটোমিক এনার্জি কমিশনের তিনজন প্রাক্তন চেয়ারপার্সন যথা এইচ এন শেঠনা, এম আর শ্রীনিবাসন ও পি কে আয়েঙ্গার সহ ৮ জন বিজ্ঞানী ভারতীয় সাংসদদের একটি দুপাতার খোলা চিঠি দিয়ে যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে যে ভারত-মার্কিণ যে চুক্তিটি মার্কিণ মূলুকে অনুমোদিত হয়েছে তা পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে দেশের স্বাধীন গবেষণার স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করবে। এব্যাপারে তারা আরও মনে করেন যে দেশের গবেষণা ও প্রযুক্তির বিকাশ কোন বাইরের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়। (দি হিন্দু, ১৬.১২.২০০৬)

শাসক বামপন্থীদের ভূমিকা

সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের বামপন্থী তথা মার্কসবাদী আন্দোলনের যেমন অনেক উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে তেমনি তার সাথে সাথে রয়েছে বামপন্থা তথা মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। এই বিশ্বাসঘাতকতার বীজ লুকিয়েছিল স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ার বৈপ্লবিক পথ পরিত্যাগ করে এই আপাত সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার গড়ে মানুষকে রিলিফ দেবার কর্মসূচীর মধ্যে। আর এই বিশ্বাসঘাতকতা এক তীব্র মাত্রায় পৌঁছেচে কয়েকটি রাজ্যে এরা সরকারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর। গত কয়েক দশক ধরে এরা মূলগতভাবে কৃষক-শ্রমিকসহ সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে পরিচালিত আন্দোলনগুলিকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখার মাধ্যমে ভারতীয় শাসকদের বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে। পরমাণু নিয়ে বিষয়টিও এর ব্যতিক্রম নয়।

তবে ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে জণগনের সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করবার ক্ষেত্রে বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক তথা বামপন্থীরা। প্রাথমিকভাবে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে ও সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির আভ্যন্তরীণ মিত্রদের চিহ্নিত না করে সংগ্রামের বর্ষামুখকে এরা ভোঁতা করে দিয়েছে। আর তারপরে বিশ্ব পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে কৌশলে মানুষের ক্ষোভকে প্রশমিত করে এরাই সরকারকে এই বিশ্বায়নের আক্রমণ নামানোর সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমানে এরাই পশ্চিমবঙ্গে নয়া অর্থনীতির সবচেয়ে বড় রুপকার কারণ বর্তমানে তারা মনে করছে যে বিশ্বায়নের যুগে এই কর্মসূচীর রুপায়ন না ঘটিয়ে নাকি উন্নয়ন করা যায় না। যেখানে দেশের কোন আইন খাটবে না এরকম ভয়ঙ্কর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ) গড়বার জন্য আজ তারা মরীয়া। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব ও সেজ গড়ে তোলার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষদের নির্বিচারে হত্যা ও মহিলাদের উপর গণধর্ষন চালিয়ে এরা সাম্রাজ্যবাদী ও তার ভারতীয় দোসরদের বিরাট বিশ্বাস অর্জন করেছে। এই শাসক বামপন্থীরা একচেটিয়া পুঁজির এতটাই দালাল হয়ে উঠেছে যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে রিলায়েন্স, ওয়ালমার্টের

মতো কোম্পানীগুলিকে সাদরে আহ্বান করে প্রায় ১ কোটি মানুষের জীবন জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলতে এদের সামান্য লজ্জাও হয় না।

নির্বাচনী রাজনীতির দিকে তাকিয়ে অন্যান্য দলের মতোই শাসক বামপন্থীরাও মানুষের ক্ষোভগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে চায়। কয়েকটি রাজ্য ছাড়া ভারতের বাকী অঞ্চলে বামপন্থীরা দুর্বল হবার কারণে এবং ভারতীয় জনগণের একটি বড় অংশের মার্কিণ আগ্রাসী নীতির প্রতি ঘৃণা ও পরমাণু প্রকল্প বিরোধী মনোভাব থাকাতে তারা এই বিষয়টিকে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চাইছে। কিন্তু একইসাথে কৌশলে চুক্তির কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবার পরই তারা এর বিরোধিতা করে একটি প্রগতিশীল চরিত্র তুলে ধরতে চাইছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামপন্থীদের কার্যকলাপের ইতিহাস বলছে যে আগেও তারা যেমন ভারত সরকারের মৌলিক কোন নীতির শেষপর্যন্ত বিরোধিতা করেনি, ঘটনার গতি যেভাবে এগিয়েছে বা বর্তমানে এগোচ্ছে তা থেকে প্রায় পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। এদের বক্তব্যগুলি একটু খেয়াল করে দেখা যাক;

১) প্রকাশ কারাত বার বার জোর দিয়ে বলছেন যে তারা পরমাণু বিদ্যুতের বিপক্ষে নয়।

২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এই চুক্তি দেশের স্বাধীনভাবে বিদেশনীতি নির্ধারণ ও দেশের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে এক বড় বিপদ।

কিন্তু এত বড় বিপদের কথা বলেও তারা একইসাথে জোর দিয়ে ঘোষনা করেছেন ;

৩) তারা এই বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা চান কিন্তু ভোটাভুটি চান না। আর সরকার যে তারা ফেলতে চান না তার উপর তারা বারে বারে জোর দিয়েছেন।

প্রকাশ কারাতের কথাই শোনা যাক : ‘‘বাম - ইউ পি এ কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভার আগে ২২শে জুলাই বামপন্থী পার্টিগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করে যে পরমাণু চুক্তির বিষয়টি সংসদে তোলা হবে এবং এব্যাপারে সংসদের একটা মতামত প্রকাশ করাটা জরুরী। কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভাতে এটা ঠিক হয়েছিল যে এই বিষয়টির উপর ভোটাভুটি করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে না।(পিপলস ডেমোক্র্যাসি, আগষ্ট, ২০০৬)

একইভাবে মার্কিণ কংগ্রেসে পরমাণু চুক্তির বিলটি অনুমোদিত হবার পর সাংবাদিকরা যখন কারাতকে প্রশ্ন করে যে তারা এই চুক্তির বিরোধী কিনা, তখন কারাত এর উত্তর এড়িয়ে যায় এবং ইয়েচুরী পরিস্কারভাবে বলেন, ‘‘আমরা এই বিলটিকে সমর্থনও করছি না আবার বিরোধিতাও করছি না। পরিস্থিতির বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’’(আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১২.১২.২০০৬)

হ্যা, পরিস্থিতির বিচার করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত কয়েক মাস ধরে তারা বলে আসছিলেন যে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আই এ ই এ)-র সাথে ভারত সরকারের আলোচনায় বসার অর্থ এই চুক্তিটির প্রায় অনুমোদন পেয়ে যাওয়া। অতএব এই আলোচনায় বসা যাবে না। কিন্তু নন্দীগ্রামের জনগণের উপর তাদের পার্টির ফ্যাসিস্ত আক্রমণ ও তার বিরুদ্ধে উত্তাল গণ আন্দোলন জাতীয় রাজনীতিতে তাদের পক্ষে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরী করে তাতে তারা মাথা নামিয়ে নির্লজ্জের মতো আই এ ই এ-র সাথে সরকারের আলোচনার বিরোধিতার পথ থেকে সরে আসেন। খালি তাই নয়, তাদের এই সিদ্ধান্ত তারা তড়িঘড়ি কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিজেরা গিয়ে জানিয়ে আসেন।

যে পরমাণু বিদ্যুতের অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সেক্ষেত্রেও এদের কোন আলাদা নীতি কোনওকালে ছিলও না এখনও নেই। রাজ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়বার জন্য বাম সরকার পরমাণু কেন্দ্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে কয়েক বছর ধরে মিথ্যাচার চালিয়ে আসছে। ২০০০ সালে এরা সুন্দরবন অঞ্চলে পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র গড়বার উদ্যোগ নিলে তার বিরুদ্ধে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ফোরাম, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি সহ আরও বিজ্ঞান সংগঠন ও গণতান্ত্রিক মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। সেসময় একটি প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ ব্যাপক লাঠি চালনা করলে বহু মানুষ আহত হয়। তখনকার মতো মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে রাজ্য সরকার পিছিয়ে গেলেও বর্তমানে এরা আবার মেদিনীপুর জেলার হরিপুরে ব্যাপক মানুষকে বাসভূমি ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়বার জন্য পরিকল্পনা করেছে। খরচের তুলনায় পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনে অক্ষমতা ও তার বিপদ সম্পর্কে যারা মানুষকে অবহিত করছে তাদেরকে আক্রমণ করে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘‘প্রচুর মিথ্যা কথা রটনা করা হচ্ছে। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে মাছের ক্ষতি হবে, জল দুষিত হবে এরকম মিথ্যা প্রচার চলতে দেওয়া হচ্ছে।’’(গণশক্তি, ২০.১১.০৬) এ ছাড়াও তিনি গর্বের সাথে ঘোষনা করেছেন, ‘‘বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়বই।’’ (গণশক্তি, ২৫.১১.০৬) আর এর সাথে সঙ্গতি রেখে ও মানুষকে অন্ধকারে রেখে ভারত-মার্কিণ পরমানু চুক্তির প্রায় শেষ পর্বে এরা বিরোধিতার এক ধোঁয়া তুলেছে যাতে এরকম নির্লজ্জ চুক্তি কার্যকরীও হয়ে যায় আবার তার অংশীদারও না হতে হয় [১০]।

শেষের কথা

নিউক্লিয়ার বিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদনের আবিস্কার মানবজাতির জন্য নিশ্চয়ই একটি সম্ভাবনাময় দিক। এক্ষেত্রে মূল পরমাণু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গত হয় না সেই ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখনও এই

প্রযুক্তি এমন একটা স্তরে যেতে পারেনি যাতে এইভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষত ভারতের মতো গরীব দেশের পক্ষে সবদিক দিয়ে মঙ্গলজনক হয়। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে ও যে বর্জ্য তৈরী হয় তা সাংঘাতিক বিপজ্জনক ও যার প্রভাব গ্রীনহাউস গ্যাসের চেয়েও মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে মানুষের গবেষণা ও তা থেকে অর্জিত জ্ঞান এই প্রযুক্তিকে ভবিষ্যতে ব্যবহারযোগ্য স্তরে নিয়ে যেতে পারবে না। এই মুহূর্তে যা দরকার তা হচ্ছে মানবজাতির জন্য যা বিপজ্জনক সেই সমস্ত পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করবার জন্য সংগ্রাম চালানো। আর এই সংগ্রামের মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিগুলির উপর বিরাট চাপ তৈরী করা জরুরী কারণ সেটা না হলে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি সেই সংগ্রামকে দুর্বল দেশগুলির পরমাণু গবেষণার বিরুদ্ধে চালিত করবে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলেই পরমাণু শক্তিহীন দেশের পরমাণু অস্ত্র তৈরী করবার আকাঙ্খা বিলুপ্ত হবে। এরকম পরিস্থিতিতেই পরমাণু গবেষণা চালিত হতে পারবে মানবজাতির কল্যাণের লক্ষ্যে। কিন্তু এই পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজির রাজত্বে এরকম ব্যাপার খুব সহজে ঘটবে এমনটা আশা করা ভুল হবে। মুনাফার লক্ষ্যে ও মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে শক্তিধর দেশের ব্যবসায়ীরা একদিকে যেমন পরমাণু প্রযুক্তি ও জ্বালানী নিয়ে ব্যবসা চালাবে তেমনি তার সাথে সাথে পরমাণু অস্ত্র মজুত করে সামরিক শক্তির বৈষম্য টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাবে। বর্তমান অবস্থায় ভারত-মার্কিণ পরমাণু চুক্তি দেশের এলিট অংশ ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের যথাক্রমে জীবনধারণ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুযোগ করে দিতে পারে, কিন্তু আপামর জনসাধারণের কোন সমস্যার সমাধান এতে হবে না, এমনকি এতে গরীব মানুষের বিদ্যুতের চাহিদাও মেটানো হবে না। উল্টে এই চুক্তির ফলে ভারতীয় জনগণকে মার্কিণী আগ্রাসী পরিকল্পনার অংশীদার হবার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে গুণাগার দিতে হবে। এমতাবস্থায় সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষকে এই পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করতে হবে ও কেবল বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নয়, গোটা উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশ্নে দেশের মানুষের স্বার্থের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং তাদের উদ্যোগের উপর নির্ভর করে পদক্ষেপ গ্রহণ করবার দাবীকে সামনে রাখতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

এই প্রবন্ধ তৈরী করতে 'শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের অপ-উন্নয়ন বিরোধী মঞ্চ'(TASAM) -এর একাধিক বিজ্ঞানী ও শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১) The USSR Proposes Disarmament (1920-1980) – Progress Publishers, Moscow, 1986.

২) ক) 'নিউক্লিয়ার শক্তি কেন চাই না', সৌমেন গুহ, গনবিজ্ঞান ভাবনা, ১৯৯৯।

খ) 'কেন আমরা পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে', গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ, জানুয়ারী, ২০০০।

৩) 'Going critical', R.Ramachandran, Frontline, Vol.24-issue17, 2007.

৪) 'The Future of nuclear power', An Interdisciplinary MIT Study, 2003.

৫) 'India means nuclear Business', Siddharth Srivastava, Asia Times, Nov 22, 2006.

৬) 'Indo-US Nuclear Deal', Sukla Sen, Bharatiya Samajik Chintan, Vol.V, 2007.

৭)'দেশের শক্তি সুরক্ষার কারণে পরমাণু চুক্তির প্রয়োজন নেই', দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯ আগষ্ট ২০০৭।

৮) 'India's Nuclear Power', Avilash Roul, www.ecoworld.com

৯) 'Client State', Aspects of India's Economy, No. 41, December 2005.

১০) 'ভারত - মার্কিণ পরমাণু চুক্তি ও আজকের পৃথিবী', নিমাই গোস্বামী, অনীক, সেপ্টেম্বর, ২০০৭।